রোমান্টিক

সেই আদুরে দিন

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান

১

১৯৯৫ সাল।

সময়টা এখনকার মতো এত জটিল ছিল না, আলসেমিতে ভরা ছিল। বিশেষ করে মফস্বল শহরের দুপুরগুলো।

রোদ চনচন করছে, রাস্তাঘাটের কুকুরগুলোও ছায়ার খোঁজে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। মানুষের সাড়াশব্দ নেই, শুধু মাঝে মাঝে কোনো ঘর থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মতো রেডিওর শব্দ ভেসে আসে - 'পরবর্তী গানটি পাঠিয়েছেন টাঙ্গাইলের দেলোয়ার হোসেন...'

আমাদের কোয়ার্টারটা ছিল শহরের ঠিক শেষ মাথায়। লাল ইটের দোতলা বাড়ি। নিচে আমরা থাকি। সামনে সামান্য একটু বাগান, পেছনে আম-কাঁঠালের জঙ্গল। দুপুর হলে সেই জঙ্গল থেকে একটা কেমন সোঁদা গন্ধ আসত। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে কোনো এক মায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা যেত - 'এখনই চোখ বন্ধ কর, নয়তো পিঠের চামড়া থাকবে না!'

দূর থেকে রেডিওতে তখন অনুরোধের আসর – 'পরবর্তী গানটি পাঠিয়েছেন টাঙ্গাইলের দেলোয়ার হোসেন...'

আমার নাম সজল। ক্লাস এইটে পড়ি। অংক আমার কাছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। কোনোভাবেই মাথায় ঢোকে না। বাবা মানুষটা হিমালয়ের মতো শান্ত। কেউ গালি দিলেও তিনি হয়তো উল্টো হেসে বলবেন, "অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।" মা ঠিক তার উল্টো। মাটির চুলোয় জ্বাল দেওয়া কড়াইয়ের মতো সবসময় টগবগ করে ফুটছেন। মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, আমি এই পৃথিবীতে এসেছি শুধু উনাকে জ্বালিয়ে মারার জন্য।

তবে আমার একটা জগৎ আছে। সেই জগতের অধিশ্বরীর নাম রুপালী। আমাদের পাশের কোয়ার্টারের মেয়ে। একই ক্লাসে পড়ি, একই সেকশন। রুপালী মেয়েটার চোখের ভেতর এক ধরনের ঘোর আছে। সে তাকালে মনে হয় মহাবিশ্বের কোনো রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে।

সেদিন ছিল ভ্যাপসা গরমের এক দুপুর। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে সকালে। মা কড়া গলায় হুকুম দিলেন, 'সজল!'
আমি মাটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী?'
'খবরদার, বাইরে যাবি না। খেয়ে ঘুমাবি। বিকেলে অংক স্যার আসবে।'

অংক স্যারের নাম বলতেই পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। স্যারের চশমাটা সবসময় নাকের ডগায় এসে ঝুলে থাকে। মনে হয়, এই পড়ল বলে। কিন্তু পড়ে না। স্যারের চশমা আর আমার মাথায় অংক না ঢোকা - দু'টোই আমার কাছে বিরাট রহস্য।

ভাত খেয়ে মা প্রায় টেনেহিঁচড়ে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।
'চোখ বন্ধ কর।'
আমি চোখ বন্ধ করলাম। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন। তারপর তার রান্নাঘরে ব্যস্ততা শুরু হলো। আমি জানি, এই সুযোগ।

বিড়ালের মতো পা ফেলে বিছানা থেকে নামলাম। জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম। রুপালীদের জানালার পর্দা সামান্য সরানো। এটা আমাদের গোপন সংকেত। পর্দা সরানো মানে হলো - 'আমি রেডি, তুই?'

পেছনের দরজা দিয়ে বেরোলাম। দেয়াল টপকানো আমাদের কাছে পানিভাত। দেয়াল টপকে রুপালীদের উঠোনে নামতেই দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে চোখে ইশারা করল। অর্থাৎ, তার মা'ও ঘুমিয়েছে।

রুপালী ফিসফিস করে বলল, 'কী রে, এলি?'
'না এসে উপায় আছে? মা তো প্রায় জেল খানায় ঢুকায়ছে।'
'আমারও এক অবস্থা। চল, কিছু একটা করি। বাইরে যাবি?'
'কী করবি? বিকালে আমার অংক স্যার আসবে।'
রুপালী মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ধুর তোর অংক স্যার! চল, পেছনের মাঠে যাই। কারা নাকি ঘুড়ি ওড়ায়।'
'মা জানতে পারলে কী হবে ভেবে দেখেছিস? পিঠের চামড়া থাকবে না।'
'জানবে না। স্যারের আসার আগেই চলে আসব।'

রুপালীর কথায় জাদু আছে। ওর কোনো প্রস্তাব না করা যায় না।

আমরা দেয়াল টপকে বাইরে বেরোলাম। কোয়ার্টারের রাস্তা একেবারে ফাঁকা। গরমে কুকুর পর্যন্ত নিস্তেজ। দুজন নিঃশব্দে কোয়ার্টারের সীমানা ছাড়ালাম। পেছনের মাঠটা আসলে একটা বিশাল ফাঁকা জায়গা। গিয়ে দেখি, কাকপক্ষীও নেই।

রুপালী হতাশ গলায় বলল, 'কেউ তো নেই।'
আমি ভাব নিয়ে বললাম, 'আমি তো আগেই জানতাম। আমার কথা তো শুনিস না।'
'চুপ কর তো। যখন এসেই পড়েছি, চল একটু বসি।'

আমরা ঝোপের আড়ালে বসলাম। রুপালী চুলের গোছা সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা সজল, তুই বড় হয়ে কী হবি?'
আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। অভিনেতা হলে কেমন হয়?
বললাম, 'জানি না। বাবা তো বলে ইঞ্জিনিয়ার হতে।'
'ইঞ্জিনিয়াররা কী করে?'
'এইসব বানায়। বিল্ডিং, রাস্তা।'
'তোর ভালো লাগে?'
'একদম না। আমার পাইলট হতে ইচ্ছা করে।'
রুপালী চোখ বড় বড় করে বলল, 'পাইলট? মানে আকাশে উড়বি?'
'হ্যাঁ। তোকে নিয়ে উড়ব।'
রুপালী লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিল। ফিসফিস করে বলল, 'সত্যি নিবি?'
'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। তিন সত্যি।'

রুপালী বলল, সে নাকি চিত্রশিল্পী হবে। তার আঁকা ছবি গ্যালারিতে থাকবে। আমি মনে মনে হাসলাম। ওর আঁকার হাত আমি দেখেছি। মানুষ আঁকলে দেখতে লাগে পেঁচার বাচ্চার মতো।

হঠাৎ কোত্থেকে একদল ছেলে এসে হাজির হলো। হাতে নাটাই আর ঘুড়ি। একটা লাল রঙের ড্রাগন ঘুড়ি দেখতে দেখতে আকাশে উঠে গেল। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। রুপালী আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'চল, ঘুড়ি ওড়াই।'
আমি বললাম, 'ওরা দেবে?'
'চেষ্টা করতে দোষ কী?'

রুপালী সোজা ছেলেগুলোর দিকে হেঁটে গেল। দলের সবচেয়ে লম্বা ছেলেটাকে বলল, 'ভাইয়া, আমাদের একটু ঘুড়িটা ওড়াতে দেবেন?'
ছেলেটা এমনভাবে তাকালো যেন আমরা চিড়িয়াখানার প্রাণী। তারপর হেসে বলল, 'পারবে?'
রুপালী আমার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ও খুব ভালো পারে।'

আমি জীবনে ঘুড়ি ছুঁয়েও দেখিনি। কিন্তু এখন তো মানসম্মানের প্রশ্ন। কাঁপা কাঁপা হাতে নাটাইটা নিলাম। যা হওয়ার তাই হলো। ঘুড়িটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ল। ছেলেগুলো হো হো করে হেসে উঠল। আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

অপমানে দুজন বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। রুপালী কোনো কথা বলছে না। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। ওর জন্যই এসব হলো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে রুপালী দাঁড়াল। বলল, 'তোর খারাপ লেগেছে, তাই না?'
আমি মুখ ঘুরিয়ে বললাম, 'না।'
'মিথ্যা বলিস না। তোর মুখ দেখলেই আমি সব বুঝতে পারি।'
'তাহলে জিজ্ঞেস করছিস কেন?'
'সরি রে...'

ওর কথা শেষ হলো না। আমাদের চোখ পড়ল রাস্তার পাশের ড্রেনটার দিকে। পানিতে ছোট ছোট ব্যাঙের বাচ্চা কিলবিল করছে। আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল।
আমি বললাম, 'চল, ব্যাঙের বাচ্চা ধরি।'
রুপালী অবাক হয়ে বলল, 'কী করবি?'
'অংক স্যারের চেয়ারের নিচে রেখে দেব। স্যার বসলেই লাফাবে।'
শুনে রুপালীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হাততালি দিয়ে বলল, 'দারুণ আইডিয়া! চল, চল।'

কখন যে আমাদের সারা গায়ে কাদা মেখে ভূত হয়ে গেছে, খেয়ালই নেই। যখন খেয়াল হলো, তখন বিকেল। আমরা দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটলাম।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অংক স্যার। তার পাশে অগ্নিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার মা। আমাদের এই চেহারা দেখে তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হতে লাগল।

মা স্যারের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, ‘স্যার, আজ বাদ দেন। কাল আসবেন।’

স্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর সাইকেলে উঠে চলে গেলেন। মা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মায়ের হাতের চড় যে এত শক্ত হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। পিঠের ওপর দুমদাম করে কয়েকটা কিল পড়ল।

‘হারামজাদা! কোথায় ছিলি? এই তোর শরীর খারাপ?’

আমি কেঁদে ফেললাম। রুপালীও ভয়ে কাঁপছে। ওর মা বারান্দা থেকে চোখ গরম করে ডাকছেন। ‘রুপালী! এই রুপালী ঘরে আয়।’

রাতে পিঠের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি। তার চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছে মনে। রুপালীর জন্য এত মার খেলাম, ও একবার দেখতেও এলো না।

হঠাৎ জানালার বাইরে টোকা দেওয়ার শব্দ।
উঠে গিয়ে দেখি রুপালী। হাতে একটা বাটি।

ফিসফিস করে বলল, ‘তোর জন্য পায়েস এনেছি। মা বানিয়েছিল।’
আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘মা বকবে না?’
‘মা ঘুমিয়ে পড়েছে। তোর খুব লেগেছে রে?’

ওর গলার স্বরে আমার সব রাগ, সব কষ্ট ধুয়ে গেল। আমি বাটিটা হাতে নিয়ে বললাম, ‘না, তেমন লাগেনি।’
‘নে, খা। আমি যাই।’

রুপালী চলে গেল। আমি পায়েসের বাটি হাতে বসে রইলাম। রাতের নিস্তব্ধতা, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, আর মিষ্টি পায়েস - সব মিলিয়ে মনে হলো, এই মার খাওয়া কোন ব্যাপারই না। এই ছোট ছোট ভালো লাগার মুহূর্তগুলোর কাছে ওসব কিছুই না। আদুরে দিনগুলি বুঝি এভাবেই তৈরি হয়!

২

পরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় মনটা বেশ ফুরফুরে। রাতের পায়েসের রেশটা বোধহয় রয়ে গেছে। রুপালীকে দেখে হাসলাম। সে-ও হাসল। কালকের মারধরের ব্যাপারটা কেউ আর মনে রাখেনি। ছোটদের অভিমান বেশিক্ষণ থাকে না।

ক্লাসে ঢুকে মেজাজটা বিগড়ে গেল। প্রথম পিরিয়ডই ইতিহাস।
মতিন স্যার ক্লাসে ঢুকেই এমন একটা ভাব ধরেন, যেন তিনি স্বচক্ষে পলাশীর যুদ্ধ দেখে এসেছেন। তার পড়ানোর ভঙ্গিও অদ্ভুত। কবিতার মতো সুর করে পড়েন।

'এবং এইভাবে, ইংরেজ সৈন্যরা, অতিশয় ধূর্ততার সহিত, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনভার, আপনাদের হস্তে তুলিয়া লইল...'

আমার হাই আসছে। জানালার বাইরে একটা চড়ুই পাখি দেয়ালে বসে পালক পরিষ্কার করছে। কী আরামের জীবন! আর আমরা এখানে বসে ইতিহাসের সাল তারিখ মুখস্থ করছি।

আমার পাশে মিলন বসা। সে খাতার পেছনে কী যেন আঁকছে। উঁকি দিয়ে দেখি, একটা নদী। নদীতে নৌকা।
মিলন ফিসফিস করে বলল, 'চল, পালাই।'
আমি চমকে উঠলাম। 'পালাবি? মানে?'
'মানে স্কুল থেকে পালাব। নদীর ধারে যাব।'
'স্যার টের পেলে?'
'কিছু টের পাবে না। টিফিনের পর। শেষ দুই পিরিয়ড ড্রয়িং আর পিটি। ওই স্যাররা ক্লাসে না থাকলেও চলে।'

প্রস্তাবটা শুনে বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হলো। রুপালীর দিকে তাকালাম। সে দুই বেঞ্চ সামনে। মিলন দেখি এর মধ্যেই চিরকুট পাঠিয়ে দিয়েছে। রুপালী ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। অর্থাৎ, সেও রাজি।

ব্যস, আর কী চাই! রুপালী রাজি থাকলে আমি যে কোন জায়গায় যেতে পারি। এ তো সামান্য স্কুল পালানো।

টিফিনের ঘন্টা বাজতেই আমরা চারজন এক হলাম। মিলন আমাদের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল। টিফিন শেষে সবাই যখন ক্লাসে ঢুকবে, আমরা তখন স্কুলের পেছনের ভাঙা দেয়াল টপকে হাওয়া।

যা পরিকল্পনা, তাই কাজ। বাথরুম যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে সোজা স্কুলের পেছনে। দেয়াল টপকে ওপাশে নামতেই আমার নতুন সাদা কেডস জুতোজোড়া কাদায় মাখামাখি।
রুপালী লাফ দেওয়ার সময় ফ্রকটা উঁচু করে ধরেছিল। আমি আর মিলন হাসাহাসি করছিলাম।
রুপালী রেগে গিয়ে বলল, 'একদম হাসবি না। চল্ এখন।'

আমরা রেললাইন ধরে হাঁটছি। পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছি। মুক্তির আনন্দ।
শীলা খুব ভয় পাচ্ছে। সে বারবার বলছে, 'কেউ দেখে ফেলবে না তো?'
রুপালী ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ থাক তো। এত ভয় পেলে এলি কেন?'

শহরের শেষ মাথায় এসে নদীটা দেখা গেল। নদীর ওপারে সবুজ গ্রাম। কী ভীষণ শান্ত চারপাশ! স্কুলের ইতিহাসের ক্লাসের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না।
একটা বড় গাছের নিচে বসলাম আমরা। মিলন পকেট থেকে হজমি লজেন্স বের করল। রুপালী তার ব্যাগ থেকে বের করল মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'আমি তপু'। সে প্রায়ই ক্লাসে লুকিয়ে গল্পের বই নিয়ে আসে।

নদীর বাতাসে ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। রুপালী বই বন্ধ করে বলল, 'আচ্ছা, এই নদীর ওপারে কী আছে রে?'
মিলন বিজ্ঞের মতো বলল, 'গ্রাম আছে। তারপর হয়তো আরেকটা শহর।'
'আমরা কোনোদিন যেতে পারব ওখানে?'
আমি বললাম, 'পারবি না কেন? বড় হলেই যাবি।'

এরপর আমাদের হাবিজাবি গল্প শুরু হলো। সালমান শাহ ভালো নাকি আমির খান? 'বাবা কেন চাকর' সিনেমাটা কেমন? এইসব আরকি।

একসময় রুপালী উঠে গিয়ে নদীর কিনারায় পানিতে পা ডুবিয়ে বসল। আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম।
সে আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'তোর ভয় করছে, সজল?'
আমি বললাম, 'কিসের ভয়?'
'এই যে স্কুল পালালাম। ধরা পড়লে কী হবে?'
'একটু তো করছেই। তোর করছে না?'
'করছে। কিন্তু ভালোও লাগছে। মনে হচ্ছে বিরাট একটা কাজ করে ফেলেছি।'

আমি আর কিছু বললাম না। রুপালীর পাশে বসে নদীর স্রোত দেখতে ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ সে আমার হাতে চিমটি কাটলো। ‘ওই দেখ!’

তাকিয়ে দেখি, একটু দূরে লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একটা লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।
মিলন উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। বলল, ‘কী মামা, কিছু বলবেন?’
লোকটা কোন জবাব দিল না। শীলা ভয়ে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়।
রুপালী আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, ‘চল, পালাই। লোকটাকে ভালো মনে হচ্ছে না।’

আমরা প্রায় দৌড়াতে শুরু করলাম। রেললাইন ধরে দৌড়ানো যে কী কষ্টের, সেদিন বুঝলাম। একসময় লোকালয়ে এসে হাঁপাতে লাগলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি, লোকটা নেই।
শীলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘আমি আর কোনোদিন তোদের সাথে আসব না।’
মিলন ধমক দিয়ে বলল, ‘আরে ধুর, লোকটা কিছু করত না।’

বিকেলের আলো কমে আসছে। বাড়ির দিকে হাঁটছি। রুপালী বলল, ‘জুতার কী অবস্থা করেছিস! মা আজ তোকে আস্ত রাখবে না।’
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এখন বাড়িতে কী বলব, তাই ভাবছি।
রুপালী হঠাৎ বলল, ‘আচ্ছা, লোকটা যখন আসছিল, তখন তুই আমার হাত ধরেছিলিস কেন?’
আমি অবাক হলাম। ‘আমি? তুই-ই তো আমার হাত ধরেছিলিস।’
‘মিথ্যা কথা। তুই-ই ধরেছিলিস।’
‘একদম না। তুই ভয় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরেছিলিস।’
‘যা যা, ভীতুর ডিম একটা।’

এই নিয়েই ঝগড়া করতে করতে বাড়ি চলে এলাম। আসলে আমরা দুজনেই জানি, আজকের এই ঘটনাটা আমাদের মধ্যে নতুন একটা কিছু তৈরি করেছে। একটা গোপন অভিযানের অংশীদার আমরা।

বাড়িতে ঢুকতেই মা আমার জুতার অবস্থা দেখে সব বুঝে ফেললেন।
‘স্কুল পালানো হয়েছিল, তাই না?’
আমি চুপ।
‘কথা কানে যায় না? সত্যি বল।’
মাথা নিচু করে স্বীকার করতেই হলো।

মা সেদিন মারলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, ‘আচ্ছা। বাবা আসুক রাতে। তোর ব্যবস্থা হচ্ছে।’

বাবার ব্যবস্থা মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তিনি মারেন না, কিন্তু এমন কিছু কথা বলেন যা চড়-থাপ্পড়ের চেয়েও বেশি লাগে।
রাতে বাবা সব শুনে আমাকে ডাকলেন।
চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, ‘শোনো সজল, পড়াশোনাকে ভয় পেয়ে পালানোটা কোনো বীরত্ব নয়, এটা কাপুরুষতা।’

বাবার কথাগুলো আমার মাথার অনেক ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। আমি শুধু ভাবছিলাম, বাবা কি কোনোদিন স্কুল পালাননি? তার কি নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করেনি? বড়রা নিজেদের ছোটবেলার কথা সহজে বলতে চায় না।

রাতে ঘুম আসছিল না। দেখি রুপালীদের ঘরের আলো জ্বলছে। তার মানে সে-ও জেগে আছে। হয়তো তারও আমার মতোই অবস্থা।
আমি একটা কাগজ ছিঁড়ে লিখলাম, ‘মন খারাপ করিস না। আমরা আবার পালাব।’
কাগজটা একটা ছোট ঢিলে সুতো দিয়ে বেঁধে রুপালীদের জানালায় ছুড়ে মারলাম। ‘ঠক’ করে শব্দ হলো।

একটু পর রুপালী জানালায় এলো। ইশারায় জিজ্ঞেস করল, ‘কী?’
আমি ইশারায় কাগজটা নিতে বললাম।

কাগজটা পড়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। রাতের অন্ধকারে সেই হাসিটা চাঁদের আলোর মতো লাগল। সে-ও ইশারায় জবাব দিল, ‘অবশ্যই।’

আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। বাবার বকুনি, মায়ের শাসন - কোনো কিছুই আর গায়ে লাগছে না। মনে হলো, রুপালী পাশে থাকলে কোনো ভয় নেই। এই স্কুল পালানোর দিনটা আমাদের কৈশোরের ক্যানভাসে একটা উজ্জ্বল দাগ রেখে গেল। ভয়, আনন্দ আর সিক্রেটস ভাগ করে নেওয়ার দাগ।